# Watercraft in Ancient India

## প্রাচীন ভারতে জলযান

Research Review Journal of Interdisciplinary Studies
double-blind peer-reviewed and refereed online quarterly Journal
ISSN (online): 3108-0472
1(2) 6-13, 2025
©The Author(s) 2025
10.31305/rrjis.2025.v1.n2.002
https://rrjournals.in/

**Received:** 21 Jul, 2025
**Revised:** 12 Aug, 2025
**Accepted:** 19 Sep, 2025
**Published:** 30 Sep, 2025

*Pipasa Kundu

*Independent Researcher (Subject: A.I.H.C & A)*

**Abstract:** *No matter how prominent the prohibitions against sea voyages appear in Brahmanical scriptures, there is no doubt that in practice such restrictions were not strictly followed. When merchants undertook sea voyages aboard ocean-going vessels, they were identified as potavanik and were also referred to as sanyatrik. The presence and use of these terms indicate that Indians engaged in maritime travel in the distant past. However, Indian nautical archaeology related to this subject is still in its infancy. Therefore, to learn about ancient watercraft, we must rely on literary descriptions, testimonies of foreigners, epigraphic evidence, and sculptures and paintings depicting watercraft in art. But what were these ancient sea-going vessels like? According to Bhoja's Yuktikalpataru, watercraft were divided into two main categories – 'Samanya' (boats used for river routes) and 'Vishesha' (sea-going vessels). Although there are instructions regarding the measurements, shape, and construction techniques of these ships, experts have doubts about their practical application. Various types of watercraft from different countries arrived at Indian ports and sailed in the waters of the Indian Ocean. References to different types of Indian vessels are found, such as 'Eppaga' and 'Kotumba' (in the Periplus of the Erythraean Sea), a boat with a tripod mast and a steering oar at the stern discovered at Chandraketugarh near Kolkata, and in the Ajanta paintings a representation of a large sea-going ship with three masts. The primary material used in shipbuilding was wood, especially Indian teak. The watercraft performed various roles. Sea-going ships carried valuable and rare goods, fragrant spices, precious gems, and extremely expensive horses. While renowned commodities were an essential part of maritime trade, their buyers were only a small number of wealthy individuals or ruling groups. At the same time, ordinary and daily necessities were also transported in much larger quantities. The watercraft were mainly used for trade. However, at times they were also involved in military activities. One thing must be kept in mind – shipbuilding was a very expensive matter. Ships were used only in complex trade of goods. A great deal of capital investment was required, and it often took a long time to earn profit. Therefore, entering this trade was not the work of any ordinary merchant. Without considering these maritime merchants, much of the maritime*

*Corresponding Author
Pipasa Kundu, Independent Researcher (Subject: A.I.H.C & A)
pipasakundu08@gmail.com



Scan and Access

Creative Commons Non Commercial CC BY-NC: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 License (http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits non-Commercial use, reproduction and distribution of the work without further permission provided the original work is attributed.

*history of the Indian Ocean remains untold. In Sanskrit sources, they are referred to as naivittika. Altogether, we see that from the Harappan period to the Gupta period, watercraft played a significant role in ancient India.*

Keywords: *Trade, Merchant, Maritime goods, Ship*

Abstract in Bengali Language: *সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের অনুশাসনের তর্জনী যতই প্রকট হোক না কেন বাস্তবে সেই নিষেধাজ্ঞা কতটা অনুসৃত হত তা নিয়ে সংশয় থেকে নয়। ব্যবসায়ীরা যখন অর্ণবপোতে চড়ে সমুদ্রযাত্রা করেন, তখন তাঁকে চিহ্নিত করতে পোতবনিক বলা হয়েছে, তিনি 'সংযাত্রিক' বলেও অভিহিত। এই শব্দগুলির উপস্থিতি ও প্রয়োগ সুদূর অতীতে ভারতীয়দের সমুদ্রযাত্রার দিকেই ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু ভারতীয় প্রত্নযান এই জাতীয় অনুসন্ধান এখনও শৈশবাবস্থায়। তাই প্রাচীন- জলযানের কথা জানতে হলে আমাদের আশ্রয় সাহিত্যগত বর্ননা, বিদেশীদের জবানবন্দী, লেখমালার সাক্ষ্য এবং শিল্পকলায় জলযানের ভাস্কর্য ও চিত্র। কিন্তু কেমন ছিল এই সমুদ্রগামী প্রাচীন জলযান গুলি? ভোজ প্রনীত 'যুক্তিকল্পতরু' অনুযায়ী জলযানের দুই প্রধান বিভাগ ছিল- 'সামান্য' (নদীপথে ব্যবহার্য তরণী) ও বিশেষ' (সমুদ্রগামী তরণী)। এই সব জাহাজের মাপজোক, আকার, গঠন কৌশল নিয়ে নির্দেশাবলী আছে ঠিকই কিন্তু তার কার্যকরী নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সন্দেহ আছে। বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতের বন্দর গুলিতে ও ভারত সমুদ্রের জলে বিভিন্ন প্রকার জলযানের আগমন ছিল। ভারতীয় বিভিন্ন ধরনের জলযানের পরিচয় পায়। যেমন- 'এপ্পগ ও কোটুম্ব' ('পেরিপ্লাস অব দ্য ইরিথ্রিয়ান সী'), কলকাতার কাছে চন্দ্রকেতুগড়ে তেপায়া মাস্তুল যার পশ্চাদভাগে দাঁড় যুক্ত জলযান, অজন্তা চিত্রকলায় একটি বৃহৎ সমুদ্রগামী জাহাজের প্রতিকৃতি দেখা যায়- যেটা তিন মাস্তুলওয়ালা। জাহাজ নির্মানের ক্ষেত্রে প্রধান উপকরণ কাঠ, বিশেষত ভারতের সেগুন কাঠ। "জলযানগুলি বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতো। সমুদ্রগামী জাহাজে মূল্যবান, দুষ্প্রাপ্য পণ্যসামগ্রী, সুগন্ধী মশলা", বহুমূল্য রত্ন, অত্যন্ত দামি ঘোড়া প্রভৃতি। নামীদামী পণ্য সমুদ্রবাণিজ্যের অত্যতম অঙ্গ ঠিকই কিন্তু তার খরিদ্দারও সামান্য সংখ্যক বিত্তশালী ব্যক্তি বা শাসক সম্প্রদায়। কিন্তু পাশাপাশি নিতান্ত আটপৌরে, নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুও অনেকটা বেশি পরিমানে জাহাজে তোলা হত। জলযান গুলি মূলত বানিজ্যের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হত। তবে কখনও কখনও জঙ্গি ক্রিয়াকলাপেও তাদের সামিল করা হয়েছে। একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে- জাহাজ তৈরি করা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। জাহাজ কেবলমাত্র পণ্য জটিল ব্যবসা। তাতে প্রচুর অর্থ বিনিযোগ করার ওপর লাভ পেতে অনেক সময় লাগত। ফলে এই ব্যবসায়ে নামা যেকোনও বনিকের কর্ম নয়। এই জাহাজি বনিকদের বাদ দিলে ভারত মহাসাগরের জাহাজি ইতিবৃত্তের অনেকটাই অকথিত থাকে। এঁরা নিঃসন্দেহে দীর্ঘকাল ধরে বানিজ্যিক ইতিহাসে যুক্ত হয়ে আছে। সংস্কৃত সূত্রে এদের পরিচয় নৈবিত্তিক। সবমিলিয়ে আমরা দেখতে পাই প্রাচীন ভারতে হরপ্পা যুগ থেকে গুপ্ত পর্যন্ত সময়ে জলযানের বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।*

Keywords: *বাণিজ্য, বণিক, সমুদ্র পণ্য- সামগ্রী, জাহাজ।*

ইউরোপীয় তথা ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে পদার্পণ করেছিল প্রধানত বাণিজ্যিক কারণে। পরবর্তীকালে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে উদ্ভাসিত হল তা শাসকের রূপ নিয়েছিল। ক্রমে এই দেশকে সুপরিকল্পিতভাবে শাসনকার্যের জন্য এবং লুণ্ঠনের আশায় সর্বপ্রথমে যেটার প্রয়োজন বোধ হয়েছিল ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে বোধগম্য করার। আর তার জন্য সর্ববিধ প্রয়োজন ছিল ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস চর্চার। বস্তুতপক্ষে ইউরোপীয় তথা ব্রিটিশদের ভারতের অতীত চর্চায় প্রণোদিত করেছিল সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। সুতরাং ভারত ইতিহাস চর্চার পথিকৃতের গৌরব ও মর্যাদা তাদের অবশ্যই প্রাপ্য। রাজনৈতিক, অর্থনীতি, সামাজিক তথা আইনের শাসনে পাশ্চাত্য যে প্রাচ্যের থেকে প্রাগ্রসর – এই ধারণাকে পাকাপোক্ত রূপ দেবার সচেতন চেষ্টা ঔপনিবেশিক ইতিহাস চর্চায় প্রকট। এই জাতীয় ইতিহাসচর্চা এই মর্মে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, ভারতীয় সভ্যতা জগদ্দল পাথরের মতো স্থির, কৃষিপ্রধান গ্রামসমাজ কূপমণ্ডূকতায় আচ্ছন্ন, সমাজ পরিবর্তন বিমুখ। এমনকি ভারতীয়রা সমুদ্রবিমুখ এবং কৃষিভিত্তিক সমাজে বাণিজ্যের ভূমিকা নগণ্য।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ওর্য়ামিংটন প্রাচীন ভারতের সঙ্গে রোমের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের যাবতীয় কৃতিত্ব পশ্চিমী বণিকদের দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ভারতীয়রা সমুদ্রবাণিজ্যে বিমুখ ছিল। পশ্চিমি বণিকরাই উদ্যোগী হয়ে ভারতীয় উপকূলে দ্রুত পৌঁছেছিলেন। কিন্তু বক্তব্যের ভিন্ন মতও রয়েছে। সূদূর প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয়রা সামুদ্রিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে এসেছিল। তার প্রমাণ সহ মত প্রতিষ্ঠা করতে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর "ইণ্ডিয়ান শিপিং" গ্রন্থে। সুতরাং বিষয়টি এক পাক্ষিক ভাবে চিন্তাভাবনা করলে ত্রুটিমুক্ত হবে না।

বস্তুতপক্ষে প্রাচীন যুগে ভারতীয়রাই যে সমুদ্র-বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যিক উপাদান থেকে সমুদ্রবাণিজ্যের নিদর্শনের উল্লেখ থাকলেও তা বহুলাংশে অপ্রতুল। প্লিনির 'ন্যাচুরালিশ ইস্তেরিয়া গ্রন্থে 'মারি ইণ্ডিকম' অর্থাৎ ভারত মহাসাগর এবং টলেমির ভূগোলে (খ্রিঃ 150), 'গ্যাঙ্গেটিক গালফ' বা গাঙ্গেয় ঘাঁড়ি-র উল্লেখ প্রমাণ করে ভারতীয়রা ভারত মহাসাগর নামক সুমুদ্র সঙ্গে পরিচিতি ততদিনে গড়ে উঠেছিল। অতঃপর অষ্টম-নবম শতকে আরবি বিবরণীতে "অল-বহর-অল হিন্দি' (ভারত মহাসাগরকে বুঝিয়েছে)-র উল্লেখ আবার আরব লেখকরা ভারত মহাসাগরের পূর্বভাগ 'বহর হরকল' বা হরিকেলের সাগর (বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা অঞ্চল) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এমনকি 971 খ্রিঃ একটি সংস্কৃত লেখতে 'বঙ্গসাগর' শব্দটির প্রথম ব্যবহার হয়েছিল। এই সমস্ত কিছু উল্লেখ থেকে একথা বলা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় তথা ব্রিটিশদের আগমনের পূর্ব থেকেই মাঝিমল্লা, নাবিক, স্বদেশী বিদেশী বণিকরা, ধর্মপ্রচারক প্রমুখরা ভারত মহাসাগর সম্পর্কে সুপরিজাত ছিলেন।

সমুদ্রবাণিজ্যের মাধ্যম হিসাবে জলযানগুলির ভুমিকা কেমন ছিল সেটা জানা দরকার। তবে এই বিষয়ে তথ্য অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত এবং একেবারেই অপ্রতুল। তাই প্রাচীন জলযান সম্পর্কে জানতে আমাদের একান্ত আশ্রয় হল সাহিত্যগত বর্ণনা, বিদেশীদের ভ্রমণ বিবরণী এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান যথা- লেখমালার সাক্ষ্য এবং শিল্পকলায় বিভিন্ন জলযানের ভাস্কর্য অজন্তার গুহাচিত্রের উপর নির্ভরশীল।

প্রাচীন ভারতে জলযানগুলি মূলত কাঠের তৈরি হত। লৌহ এখানে ব্রাত্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে জলযানগুলি মূলত কাঠের পাটাতন ও দণ্ড ব্যবহৃত হত, যা জলে ভেসে থাকতে সহায়ক ছিল। লোহার দণ্ড বা পাটাতন ব্যবহৃত হত না। এক্ষেত্রে অনুমান করা যায় যে, লোহার ভিতরে থাকা সমুদ্রতলে চৌম্বক শিলার আকর্ষণে চৌম্বক শক্তি সমুদ্রের জলের লৌহনির্মিত জলযান বাধাপ্রাপ্ত হবে। মূলতঃ প্রাচীন ভারতে জলযানগুলিতে নারকেল দড়ি (রজ্জু) ব্যবহৃত হতো তখনো পর্যন্ত কড দড়ির ব্যবহার শুরু হয়নি। সাহিত্যে। জলযান অগ্রসর করার জন্য প্রধান উপকরণ দাঁড় (কোনিপাত) কাষ্ঠনির্মিত ছিল। নাঙর বা নাঙ্গরশিলা সাধারণত লৌহনির্মিত ছিল না। জলযানে বসবাসের ঘর সমকালে 'মন্দির' নামে পরিচিত ছিল। তবে বসবাসের ব্যবস্থা সেরকম কিছু ছিল না। বেশিরভাগ সময় যাত্রীরা খোলা আকাশের নীচে থাকতো। মাথার উপর আচ্ছাদন থাকলেই তা যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী ও উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হত।

জলযান-এর গঠনকৌশল ও শ্রেণিভেদ সম্পর্কে কতিপয় আলোচনা রয়েছে একাদশ শতকে রচিত ভোজের "যুক্তিকল্পতরু" গ্রন্থে। তবে তার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলেন ইতিহাসবিদ রাধাকুমুদ মুখার্জী। এই গ্রন্থ অনুসারে দুধরনের জলযান প্রচলিত ছিল, যথা-

১. সামান্য : এই ধরনের জলযান নদীপথে ব্যবহৃত হত এবং

২. বিশেষ : এটি মূলতঃ সমুদ্রপথে ব্যবহৃত হত।[১]

এখন 'সামান্য' ধরনের জলযানগুলিকে তাদের গঠন, মাপজোক ও আকৃতি অনুযায়ী মূলত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছিল। সেগুলি হল[২]-

| ক্র. নং | নাম | দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ক্ষুদ্রঃ (Khudra) | ১৬ | ৪ | ৪ |
| ২ | মধ্যমাঃ (Madhyama) | ২৪ | ১২ | ৪ |
| ৩ | ভীমঃ (Bhima) | ৪০ | ২০ | ২০ |
| ৪ | চপলাঃ (Chapala) | ৪৮ | ২৪ | ২৪ |
| ৫ | পতলাঃ (Patala) | ৬৪ | ৩২ | ৩২ |
| ৬ | ভয়াঃ (Bhaya) | ৭২ | ৩৬ | ৩৬ |
| ৭ | দীর্ঘঃ (Drigha) | ৪৪ | ৪৪ | ৪৪ |
| ৮ | পণপূটাঃ (Patraputa) | ৯৬ | ৪৮ | ৪৮ |
| ৯ | গর্ভরাঃ (Garbhara) | ১১২ | ৫৬ | ৫৬ |
| ১০ | মন্থরা (Manthara) | ১২০ | ৬০ | ৬০ |

'বিশেষ' ধরনের জলযানগুলিও মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত। এক. দীর্ঘ, এরা সম্ভবত দীর্ঘ আকৃতির। দুই উন্নত, এগুলি মূলতঃ উচ্চতা বেশি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের চেয়ে। 'দীর্ঘ' ও 'উন্নত' শ্রেণির জলযানগুলি মূলতঃ নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত[৩]-

**দীর্ঘ ( Dirgha)**

| ক্র. নং | নাম | দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | দীর্ঘিকাঃ (Dhirgika) | ৩২ | ৪ | ৩ |
| ২ | তরণীঃ (Tarani) | ৪৮ | ৬ | ৪ |
| ৩ | লোলাঃ (Lola) | ৮ | ৬ | ৪ |
| ৪ | গাটভরাঃ (Gatvara) | ৮০ | ১০ | ৮ |
| ৫ | গামিনিঃ (Gamini) | ৯৬ | ১২ | ৯ |
| ৬ | তরীঃ (Tari) | ১১২ | ১৪ | ১১ |
| ৭ | জঙ্ঘলাঃ (Ganghala) | ১২৮ | ১৬ | ১২ |
| ৮ | প্লাবিনিঃ (Plavini) | ১৪৪ | ১৮ | ১৪ |
| ৯ | ধারিনিঃ (Dharini) | ১৬০ | ২০ | ১৬ |
| ১০ | বেগিনিঃ (Begini) | ১৭৬ | ২২ | ১৭ |

**উচ্চতা**

| ক্র. নং | নাম | দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | উদ্ধত্বঃ (Unddhva) | ৩২ | ১৬ | ১৬ |
| ২ | অরুদ্ধত্বঃ (Anurddva) | ৪৮ | ২৪ | ২৪ |
| ৩ | স্বর্ণমুখিঃ (Svarnamukhi) | ৬৪ | ৩২ | ৩২ |
| ৪ | গর্ভিনিঃ (Garbhini) | ৮০ | ৪০ | ৪০ |
| ৫ | মন্থরাঃ (Manthara) | ৯৬ | ৪৮ | ৪৮ |

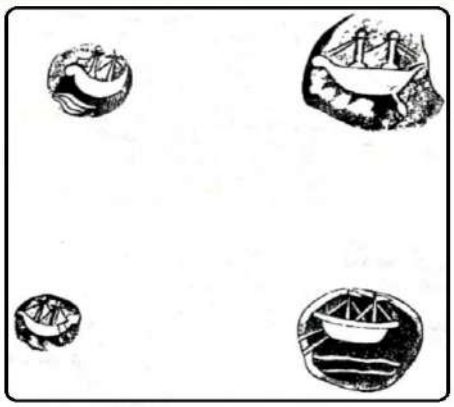

প্রথম শতকে রচিত "পেরিপ্লাস অব দ্য ইরিথ্রিয়ান সী"-এর অজ্ঞাতনামা লেখকের বর্ণনায় ভারতে দুই ধরনের জাহাজের ব্যবহার-র কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি 'এপ্পগ' এবং 'কোট্টুম্ব'। আবার জৈন গ্রন্থ অঙ্গবিজ্জাতেও এই দুপ্রকার জলযান উল্লেখ রয়েছে। বঙ্গের কলকাতার কাছে অবস্থিত চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রাপ্ত সিলমোহরের জলযানের প্রতিকৃতিতে উল্লিখিত ব্রাহ্মী খরোষ্ঠী লিপিতে একটি লেখ উৎকীর্ণ রয়েছে। সেটি পাঠোদ্ধার করেছেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনিও লেখটিতে উৎকীর্ণ জলযানটির পরিচয় 'এপ্যক' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাহলে বলা যেতে পারে মূলতঃ এই দুপ্রকার ভারতীয় জাহাজ-র চলাচল করতো। ভারতের চন্দ্রকেতুগড় সিলমোহর ছাড়া অন্য কোনো জায়গা থেকে জলযানের প্রতিকৃতি সম্বলিত সিলমোহর এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন নৃপতিদের এক ধরনের মুদ্রায় সমুদ্রগামী জলযানের প্রতিকৃতি দেখা যায়। এই মুদ্রাগুলি মূলতঃ অন্ধ্র উপকূলীয় অঞ্চলের জন্যই জারি হয়েছিল। ফলে এগুলি এপ্পগ ও কোট্টুম্ব থেকে ভিন্ন প্রকারের ছিল।

তথ্যের ঈষত্বের জন্য জলযানের যে কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা অতি সীমিত পরিমাণে বিদ্যমান। সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে পাওয়া জলযানগুলির পরিচয় নিম্নে দেখা যাকঃ-

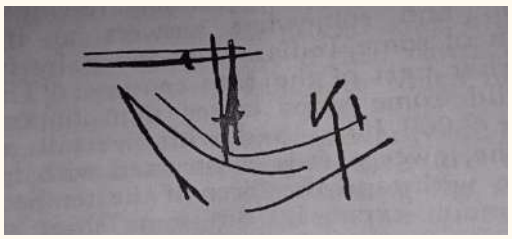

হরপ্পা সভ্যতায় সমুদ্রবাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার কথা প্রত্যেকে অবগত. কিন্তু জলযান সম্পর্কে বিশেষ তথ্য খুবই সামান্য। শুধুমাত্র মহেঞ্জোদাড়োর সিলমোহর খাড়া নদীতীরে নোঙর করার উপযোগী উঁচু মাস্তুল এবং শক্ত পশ্চাদভাগ বিশিষ্ট একটি নৌকার ছবি খোদিত রয়েছে। সেটিতে দুটি হাল নিয়ন্ত্রণকারী দাঁড় এবং একটি পাটাতন বিশিষ্ট কেবিন আছে। আমরা আরো জানতে পারি যে, হরপ্পা সভ্যতার সময়কাল থেকেই জলযানে পাল ব্যবহৃত হচ্ছে। কেননা লোথাল থেকে পাওয়া একটি কাদামাটির নমুনা নৌকোয় মাস্তুলের ভিতে একটা গর্ত আছে এবং

একটা পাত্রের গায়ে দুগজ লম্বা একটা পালতোলা নৌকার ধরনের একটা নকশা রয়েছে।[৪] এগুলিতে স্পষ্ট প্রমাণিত যে, জলযানগুলি বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো।

দ্বিতীয় উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সাঁচী স্তূপ নং-১-এর পশ্চিম গেটে একটি জলযান-এর প্রতিকৃতি ভাস্কর্য-এর নিদর্শন মেলে। এখানে একটি লম্বা মাছের লেজ ডানাযুক্ত একটি বজরা (জাহাজ) দৃশ্যমান, যার উপরে একটি সিংহাসন আকৃতির মণ্ডপ খোদিত রয়েছে এবং একজন ছত্রধর ও অপর ব্যক্তি সিংহাসন ধরে দণ্ডায়মান। অন্যদিকে তৃতীয় এক ব্যক্তি জাহাজটিকে বৃহৎ দাঁড়ের মাধ্যমে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন। আবার, চতুর্থ ব্যক্তিটি নিচে জল থেকে তৃতীয় ব্যক্তিকে সহযোগিতার করছেন বা সাহায্যের আর্জি জানাচ্ছেন বলে অনুমান হয়। জলে পুষ্পটিত ফুল, কুড়ি এবং একটি বড় ফসলের দানা রয়েছে। পাঁচজন ব্যক্তি জলে ভাসমান অবস্থায় উৎকীর্ণ রয়েছে। এটিকে দেখে মূলতঃ রাজা ও তার কিছু দরবারী প্রজাদের জন্য ব্যবহার জলযান বলে মনে হয়। অন্যদিকে জাহাজটি মাছের লেজবিশিষ্ট ডানাওয়ালা হওয়ায় বৌদ্ধধর্মের জাতকের মৎস অবতারের ভাবনায় প্রতীকীও হতে পারে বলে মনে হয়।[৫]

তৃতীয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ বঙ্গের উত্তর 24-পরগণার বেঁড়াচাপায় একটি পোড়ামাটির গোলাকার সিলমোহরের (কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ) উল্লেখ করা যায়। এখানে মাস্তুলওয়ালা নৌকা একটি ধনুকাকৃতি জাহাজের পাশে রয়েছে। মাস্তুলে সঙ্গে একটি পতাকা বাঁধা রয়েছে। জাহাজের পিছনে রয়েছে দাঁড়। জাহাজের দীর্ঘ অংশটি নৌকার দিকে নীচু হয়ে আছে এবং ক্ষুদ্র অংশটি পাটাতনের দিকে রয়েছে।[৬] ব্রাহ্মী-খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা রয়েছে ‘ভাজোযা দব্রি সুধোরধো’-যার অর্থ করলে দাঁড়ায় ‘তুমি সমুদ্রে ব্রাহ্মণদের অবলম্বন করো।’[৭] খোদিত এই শিলালিপি দেখে অনুমান করা যেতে পারে এটি সমুদ্রযাত্রার জন্য ব্যবহৃত জলযান। যদিও এটি দীর্ঘকালীন সমুদ্র ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত জলযান নাও হতে পারে।

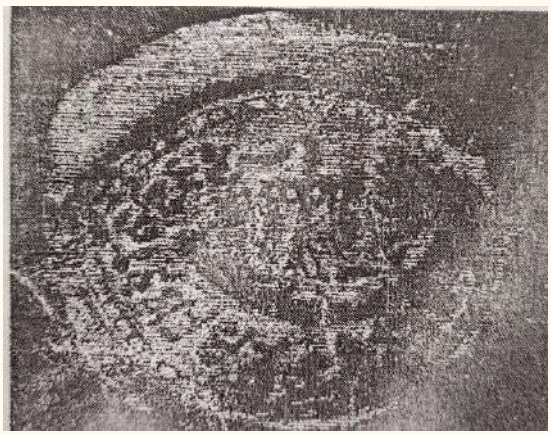

কলকাতার নিকট অবস্থিত চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি সিলমোহর-এ জাহাজের প্রতিকৃতির পরিচয় পাই। আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, এই জাহাজগুলি এপ্যক বা এপ্যগ জাতীয় জাহাজ। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই সিলমোহরগুলিতে উৎকীর্ণ ব্রাহ্মী-খরোষ্ঠী লিপি পাঠোদ্ধার করেছেন। তিনি এগুলিকে খ্রিস্টিয় প্রথম তিন শতকে উৎকীর্ণ বলে মনে করেন। এমনি একটি সিলমোহর-এ উৎকীর্ণ জলযানটি তেপায়া মাস্তুলযুক্ত। মাস্তুলের মাথায় পতাকা দেখা যায়। মাস্তুলের গায়ে আয়তকার যে বস্তু ঝুলে আছে, তা সম্ভবত গুটিয়ে রাখা ‘পাল’-এর ইঙ্গিত দেয়। যদিও এব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। পোড়ামাটির সীলমোহর-এ উৎকীর্ণ লেখটিতে ‘ত্রিদেশযাত্রা’ উল্লেখ আছে। অর্থাৎ এখান থেকে মনে করতে পারি যে, জাহাজটি তিনদিকে দেশে অর্থাৎ বিভিন্ন দিকে পাড়ি দিত। সিলমোহরের উপরের ডান দিকের অংশে শস্যের একটি শিষের প্রতিকৃতি দেখা যায়।[৮] বার্তাটি অস্পষ্ট। তবে সিলমোহরগুলি প্রায়ই ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার কারণে অনুমান করা হয় যে, এই জাহাজগুলিতে প্রধানশস্য প্রেরণ করা হতো।

চন্দ্রকেতুগড়ে তৃতীয় যে নমুনা পাই সেটা এরকম যার অগ্রভাগে পতাকা রয়েছে। তার কড়িকাঠ (বিমগুলি) গুলি দেখা যায় কিন্তু অস্পষ্টভাবে। জলযানটির অগ্রভাগ ও পিছন উভয়ই উপরের দিকে উল্টানো পিছনের দিকে একটি দাঁড় রয়েছে। যেরকম জলযানটি দেখানো হয়েছে তাতে উল্টোদিকে আরো একটি দাঁড় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।[৯] ব্রাহ্মী খরোষ্ঠী মিশ্রলিপিতে উল্লেখ আছে যে, জেমধস জুজুস্য (জয়ন্ত-শাহী-জুজহ্) ‘জুজা, বিজয়ী রাজা।’[১০] এই প্রতীকী দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব নয় যে, এই রাজার শাসনকেন্দ্র কোথায় ছিল। তবে এই জাহাজটি কোন এক

রাজার সেটা বোঝা যায়। এইখান থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, রাজা হয়তো তাঁর বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তাঁর নিজস্ব জাহাজ ব্যবহার করতেন। অন্যদিকে যদি তাকায় তাহলে দেখবো, কিছু জাতক-এর গল্পেও রাজা বা রাজপরিবারের সদস্যরা দূরবর্তী স্থানে (সুবর্ণভূমি) ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সামুদ্রিক যাত্রা করতেন তার উল্লেখ রয়েছে।[১১]

চন্দ্রকেতুগড়ে আরো একটি পোড়ামাটির সিলমোহরের প্রতিকৃতি দেখা যায় যেটা বর্তমানে কলকাতা জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। এই সিলমোহরের প্রতিকৃতিকে দেখতে পাই, জাহাজটি একক মাস্তুলওয়ালা জাহাজ। যার পাটাতন স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। জাহাজের মধ্যখানে শস্যের ডালপালাযুক্ত একটি বড়ো ঝুড়ি রাখা হয়েছে। এখান থেকে আমরা স্পষ্টভাবে অনুমান করতে পারি যে, এই জাহাজটি শস্য বহন করেছিল। এখানে ব্রাহ্মী খরোষ্ঠী মিশ্রলিপিতে উৎকীর্ণ করা আছে- 'সরিধ্যস দিজাম্মাসা জলধিসক্র (র্সুদ্বধসা দ্বিজনমাস্য জলধিসক্র)'।[১২] অর্থাৎ জাহাজটিকে জলধিসক্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। যিনি সম্পদের দেবতা হিসাবে বিখ্যাত। ইন্দ্রকে সমুদ্রের দেবতা মনে করা হত। অর্থাৎ এখানে ইন্দ্র নামক সমগ্র সম্পদের দেবতার সম্মানার্থে এই মিশ্রলিপির উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলার সিলমোহরের সদৃশ জাহাজের প্রতিকৃতির মতোই এই জাহাজটির পিছনদিক স্টিয়ারিং-এর সংযুক্ত যেটা দেখতে দাঁড়ের মতো নয়। এই স্টিয়ারিংটি জাহাজের মধ্যখানে অবস্থিত সমতল দণ্ডের সঙ্গে লম্বভাবে যুক্ত ছিল।[১৩] এই চিত্র দেখে আমরা অনুমান করতে পারি যে, জাহাজের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই স্টিয়ারিং দাঁড়টিকে লম্বভাবে রেখে সমতল-এ রাখা দণ্ডের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে।

'এপ্যক' জাতীয় জলযানগুলি কেমন ছিল তা দেখা যাক। বঙ্গদেশে, পেরিপ্লাসে ও বঙ্গবিজ্জিতে 'এপ্যক' জাতীয় জলযানের পরিচয় পাই। এটির বাঁদিকটা জলযানটির বিশালাকৃতি হয় এবং অনেক উচ্চতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। জলযানটির ডানদিকের অংশ তিনটি লম্বাভাবে দণ্ড সমান্তরালভাবে বাঁধা থাকে বন্দরে। জাহাজের মাঝখানে একক মাস্তুলযুক্ত যার উপরে একটি পতাকা ঝুলছে। মাস্তুলে মাথার কাছে একটি আয়তক্ষেত্রাকার বস্তু দেখা যায়, যেখান থেকে মনে হচ্ছে মাস্তুলের পাশে একজোড়া মনে হতে পারে। কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে পাল দেখা যায় না। মাস্তুলের বাঁদিক থেকে একটি দড়ি ঝুলছে বলে মনে হয়েছে। আবার, দড়ির শেষে ডিম্বাকৃতি জিনিস জাহাজের নীচে নামানো হয়েছে বলে মনে হয়। এ থেকে অনুমান করা হচ্ছে নোঙর-এর সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে।[১৪] এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, জাহাজটি স্থিরভাবে একটি স্থানে অবস্থান করছে কোনো বন্দরে।

এই সন্ধিক্ষণে বিভিন্ন ধরনের জলযান সম্পর্কে আরও কিছু মন্তব্য করা যেতে পারে। 'ত্রিদেশযাত্রা' গ্রহণ করতে সক্ষম ছিল অর্থাৎ দূরবর্তী যাত্রা আর সমুদ্রের ইন্দ্র নামে পরিচিত এটি অবশ্যই বিদেশী ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত ছিল। তারা বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে উপকূলীয় জাহাজের বিভাগ থেকে আলাদা। যেমন- চন্দ্রকেতুগড় থেকে আরেকটি সিলমোহরের ট্রাপ্যাক। এইভাবে বন্দরগুলিতে উপকূলীয় এবং উচ্চ-সাগরের জাহাজই শস্য পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

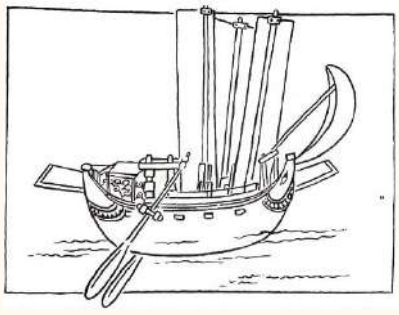

অজন্তা গুহাচিত্রে জাহাজ ও নৌকার চিত্র দেখা যায়। পণ্ডিত Griffiths সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করেন, ভারতের প্রাচীন বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য বহন করে। এখানে দুটি চিত্র গুরুত্বপূর্ণ যা জাহাজ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যাবে। প্রথম চিত্রে দেখতে পাওয়া যায় যে, একটি উচ্চ দণ্ডবিশিষ্ট সমুদ্রগামী জাহাজ যেটি অনেকগুলি খাড়া মাস্তুলযুক্ত তিনটি আয়তাকার পাল দিয়ে সংযুক্ত। প্রতিটি মাস্তুলের সঙ্গে চতুষ্কোণবিশিষ্ট পাল যুক্ত আছে। তিনকোণা ছোট পালগুলি হাওয়ার দ্বারা পূর্ণ হয়। জাহাজের ডেকের উপর চারকোণাকৃতি পাল

বিস্তৃত থাকে যা দেখতে বর্তমান সময়ের ইউরোপীয় জাহাজের মতো। দাঁড়গুলিতে সকেট ঝুলছে এবং জাহাজের অগ্রভাগে চোখ চিত্রিত হয়েছে। পিছনের দিকে দাঁড় দেখা যায় সামনে ও পিছনে দুটো ছোট প্ল্যাটফর্ম দেখা যায়।[১৫] এই চিত্রটি যুক্তিকল্পতরু অনুসারে 'অগ্রমন্দিরা' ধরনের বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ এটি নৌ-অভিযানের জন্য দীর্ঘকালীন যাত্রাবাহী জাহাজ বলে মনে করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় চিত্রে দেখা যায় এটি সম্রাটের আনন্দ মনোরঞ্জনকারী নৌকা যার হেরাল্ডিক লিম্ফ্যাডের মতো এই জাহাজের দণ্ডে ও পিছনের দিকে চোখ চিত্রিত হয়েছে। জাহাজের মাঝখানে একটি ছাউনি দেখা যায়। সামনের দিকে ছাতা আছে সেখানে সিঁড়িতে বসে থাকা জাহাজের চালককে চিত্রিত করা হয়, যা আধুনিক বার্মিজ জাহাজ নৌকাগুলিতে চেয়ারে বসে থাকা জাহাজের চালকের সঙ্গে সদৃশ বলে মনে করা হয়।[১৬] এটি যুক্তিকল্পতরু অনুযায়ী মধ্যমন্দিরা ধরনের বলে মনে হয়। অর্থাৎ এটি প্রমোদ ভ্রমণের জন্য ব্যবহারকারী জাহাজ ছিল বলে অনুমান হয়।

মহানাবিক ও নিয়ামক যখন ভারত মহাসাগরে জলযান চালাতেন তখন তাঁকে একান্তভাবে নির্ভর করতে হত মৌসুমী বায়ুর দিগবদলের উপর। মানচিত্র নেই, দূরবীন নেই, কম্পাসত্ত নেই- এক্ষেত্রে মহানাবিকরা প্রধানত দিক নির্ধারণ করতেন নক্ষত্র দেখে। এছাড়াও জলের ফেনা, জলের রঙ, জলচর পশুপ্রাণী প্রভৃতির বদল হচ্ছে কিনা, তার ওপর তীক্ষ্ম নজর রাখতে হত। জাহাজগুলি বা সামুদ্রিক ঝড়ে জাহাজ চূর্ণবিচূর্ণ হবার বর্ণনা সাহিত্যে নিয়মিত দেখা যাবে. জাহাজী ও যাত্রী উভয়ের কাছে অন্য উৎপাত হিসেবে মাঝে মাঝে হাজির হত জলদস্যুর দল। কিন্তু জলদস্যু দমনে প্রাচীন ভারতীয় রাজশক্তি বিশেষ তৎপর ছিলেন বলে মনে হয় না। একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে জাহাজ তৈরি করা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। জাহাজ কেবলমাত্র পণ্য ও যাত্রীকে বহন করে না, জাহাজ চালানোটাই একটি জটিল ব্যবসায়। তাতে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করতে হত, ঝুঁকি প্রায় সীমাহীন। লগ্নিকৃত অর্থ ফেরত পেতে বা তার ওপর লাভ পেতে বহু সময় লাগত। ফলে এই ব্যবসায়ে নামা যে কোনও বণিকের কর্ম নয়। এই জাহাজি বণিকদের বাদ দিলে ভারত মহাসাগরের জাহাজি ইতিবৃত্তের অনেকটাই অকথিত থাকে। এঁরা নিঃসন্দেহে দীর্ঘকাল ধরে বাণিজ্যিক ইতিহাসে যুক্ত হয়ে আছেন। জাহাজ মূল্যবান, দুষ্প্রাপ্য পণ্যসামগ্রী সরবরাহ করা হতো।. সমুদ্রগামী জাহাজে মসলিন, সুগন্ধী মশলা, বহুমূল্য রত্ন, অত্যন্ত দামি ঘোড়া আমদানি রপ্তানি হতো।

সুতরাং প্রাচীন ভারতবর্ষে জলযানের বিস্তারিত আলোচনার অন্তিমলগ্নে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করে প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি টানবো। ভারত উপমহাদেশে প্রাচীন যুগে উন্নত সড়কপথ না থাকার কারণে সমুদ্রযাত্রা ছিল বণিকদের কাছে বেশি আকর্ষণীয়। সুদূর অতীত থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে সমুদ্রপথে বহির্বিশ্বের একটি বাণিজ্যিক লেনদেন চালু ছিল। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে জলযানগুলির ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। স্থলযানের তুলনায় জলযানগুলি স্বল্প সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারতো। ফলস্বরূপ বাণিজ্যের গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাতায়াতের দরুণ একদিকে যেমন মিশ্রজাতির সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটে, তেমনি ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির আলোকসামান্য দিকগুলিও বহির্বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রসারিত হয়। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত হওয়া জলযানগুলি সময়ের প্রেক্ষিতে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ যে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়- বঙ্গোপসাগরকে "চোল-হ্রদে" পরিণত করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চোল সাম্রাজ্যের সুপ্রতিষ্ঠায়।

**তথ্যসূত্র :**


[1] রাধাকুমুদ মুখার্জি, এ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান শিপিং, ওরিয়েন্ট লংমান্স, বোম্বাই ক্যালকাটা মাদ্রাজ, সেকেন্ড এডিশন (রিভাইস্‌ড), ১৯৫৭,পৃষ্ঠা-১৫।

[2] তদেব, পৃ -১৫।

[3] তদেব, পৃ -১৬।

[4] শিরিন রত্নাগর, হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ-৫০।

[5] জেনেরাল এফ.সি. মাইসলে , সাঁচী অ্যান্ড ইটস্ রিমেন্স , কেগান পল কো. লিমিটেড, লন্ডন, পৃ-৪২।

[6] রণবীর চক্রবর্তী, ট্রেড অ্যান্ড ট্রেডারস ইন আর্লি ইন্ডিয়ান সোসাইটি , মনোহর, দিল্লি, থার্ড এডিশন পাব. ২০২১,পৃ-১২২।

[7] মুখার্জি , খারোষ্ঠি অ্যান্ড খারোষ্ঠি-ব্রাহ্মি ইন্সক্রিপসন, লিস্ট, নং-৫১।

[8] রণবীর চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৪।

[9] রণবীর চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৪।

[10] বোস, সোশাল অ্যান্ড রুরাল ইকোনমি, ভলিয়ম-II, পৃ-২৭।

[11] মুখার্জি , খারোষ্ঠি অ্যান্ড খারোষ্ঠি-ব্রাহ্মি ইন্সক্রিপসন, লিস্ট, নং-১৩।

[12] তদেব, পৃ-১০।

[13] রণবীর চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৫।

[14] তদেব, পৃ-১২৩।

[15] রাধাকুমুদ মুখার্জি, প্রাগুক্ত, পৃ-২৯।

[16] তদেব , পৃ-২৯।

**সহায়ক গ্রন্থ :**

[1] রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, মার্চ-২০২২।

[2] ননীগোপাল চৌধুরী, বিদেশী পর্যটক ও রাজদূতদের বর্ণনায় ভারত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, নভেম্বর -২০১৩/বি.

[3] নির্বেদ রায়, গ্রীকদের চোখে ভারতবর্ষ, পত্রভারতী, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি-২০২২।

[4] গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা- ২০২১।

[5] অশীন দাশগুপ্ত অ্যান্ড এম.এন. পিয়ারসন, ইডস, ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ওসিয়ান ১৫০০-১৮০০, ক্যালকাটা, ১৯৮৭।

[6] রণবীর চক্রবর্তী, কুণাল চক্রবর্তী, অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি-২০০০।

*Cite this article*

Kundu, P. (2025). Watercraft in Ancient India: **প্রাচীন ভারতে জলযান.** *Research Review Journal of Interdisciplinary Studies*, *1*(2), 06-13. https://doi.org/10.31305/rrjis.2025.v1.n2.002